মাসিক
বর্ণালী
আগস্ট, 2020
অবসরে সাহিত্য চর্চা,
দূর হবে বিষন্নতা
প্রথম
সংখ্যা
সম্পাদনায়
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

বর্ণালী

আগষ্ট, ২০২০

অবসরে সাহিত্য চর্চা, দূর হবে বিষন্নতা

সম্পাদনায়
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

সম্পাদনা পর্ষদ
মোঃ রাসেল সরকার
মুকীত আজমাইন শাহরিয়ার
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

উপদেষ্টা
ইব্রাহীম আদহাম
প্রভাষক, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রচ্ছদ
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক

অক্ষর বিন্যাস, প্রুফ রিডিং
মুকীত আজমাইন শাহরিয়ার

গ্রন্থসত্ত্ব ও প্রকাশনায়ঃ ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘ

প্রকাশকালঃ আগষ্ট,২০২০

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

প্রবন্ধ

টাইম ম্যানেজমেন্ট/মোঃ রাসেল সরকার

কবিতা

বার বার সহস্রবার আমি মরেছি/মোঃ রেজাউল করিম
মৃত্যু/এস.এম ইমরানুল হক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান/মোঃ শাকিল
হাসিমুখ/মোঃ সাব্বির হাসান
পথ শিশুদের ইদ/মোঃ ইসমাঈল হোসেন
স্বপ্ন আমার জন্য নয়/মুমতা হেনা মীম
মা/কায়েস মাহবুব
সেই শহর/মোঃ সাইমুম করিম
পাখির সংসার/মোঃ ইসমাঈল হোসেন
মৃত্যু উপত্যকা/মাহবুবুর আলম
কথামালা/লিটন আকন্দ
আকাঙ্ক্ষা/মোঃ শাহাদত ইসলাম
সেদিন লেগেছে ভালো/সোহাগ আলী

সাহসীকতায় আমরা/রুনা আক্তার
বৃষ্টির ছোয়া/ফাতেমা মিতু
বন্ধু/মোঃ তছলিম উদ্দীন
চেতনায় মা/মোঃ মঞ্জুরুল করিম
ইচ্ছা/কামরুজ্জামান বিবেক
কোন একসময় পদ্মানদীর তীরে/বিজয় পাল

গল্প

একটি পতাকা/মোঃ রায়হানুল ইসলাম শাকিল

ভ্রমনকাহিনী

লঞ্চ যাত্রা/রাইহান

যাদের চিত্রকর্ম স্থান পেয়েছে

তানভীর আকরাম
মোহাম্মদ রাকিব
তাসনিয়া তাবাসসুম ময়ুরী
মুমতা হেনা মীম

সম্পাদকীয়

করোনাকালীন মহামারীতে ভূতত্ত্ব সাহিত্য সংঘের উদ্যোগে প্রকাশিত হলো 'বর্ণালী' মাসিক ম্যাগাজিন এর প্রথম অনলাইন সংস্করণ। এই দূর্যোগকালীন সময়ে আমরা প্রায় সবাই জনজীবন থেকে বিছিন্ন। এই দুঃসময়ে আমরা অনেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। সাহিত্যের রসই পারে আমাদের মানসিকভাবে সুস্থ রাখতে। গৃহবন্দী অবস্থায় লেখক, কবি ও চিত্রশিল্পীদের মাঝে ফুটে উঠেছে বিচিত্র চিন্তাভাবনা। সকলের চিন্তা চেতনার বহিঃপ্রকাশ নিয়েই আমাদের এবারের আয়োজন। সাহিত্যের সাথেই থাকুন। অবসরে সাহিত্য চর্চা করুন, বিষন্নতা দূর করুন।

ধন্যবাদ
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক
সম্পাদক,
বর্ণালী ম্যাগাজিন।

প্রবন্ধ

টাইম ম্যানেজমেন্ট

"সময় পাই না" কিংবা "সময় পাচ্ছি না" কথাটা আমরা এখন খুব বেশী বলে এবং শুনে থাকি। আমরা অনেকেই বলে থাকি কিভাবে সময় চলে যাচ্ছে বুঝতেই পারছি না। অতি মূল্যবান সময়টাকে কাজে লাগানোর কিছু টিপস এন্ড ট্রিকস শেয়ার করছি। এগুলো কোনই কাজে দিবে না, যদি না প্রবল ইচ্ছাশক্তি নিয়ে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। শুধু শুধু এগুলো পড়ে ঈমান বাড়ালে হবে না, আমল ও করতে হবে।

- **To do লিস্ট তৈরি করা:**

প্রতিদিন ঘুমানোর আগে আগামীকালের জন্য একটা কাজের তালিকা তৈরী করে রাখা। একদম নির্দিষ্ট করে কোন সময়ে কতক্ষন কোন কাজটা করবো। পড়াশুনার ক্ষেত্রে একদম টপিক ধরে ধরে লিখব। ঘুমানোর আগে আগামী দিনের কাজগুলো লিখে ফেললে ব্রেইন কাজের ব্যাপারে আগে থেকেই রেডি হয়ে যায়। আর প্রত্যেকটি কাজের পর লিখা কাজটি কেটে দিবো। কাজটি করে

কেটে দেবার যে পৈশাচিক আনন্দ এটা আমাদের পরবর্তী কাজে অনুপ্রেরনা হিসেবে কাজ করে। আমাদের কাজগুলোকে ডেইলি থেকে উইকলি শিডিউল এ ভাগ করে নিলে আলসেমি আসার সুযোগ পাবে না। আর আজকের কিছু বাকি কাজ আগামীকাল বেশী করে পুষিয়ে নিবো, এরকম চিন্তা আশেপাশে ঘেষতেও দিবো না। Urgent, Important and Necessary এর মধ্যে পার্থক্য করা শিখতে হবে। যেমন: আগামীকাল আমার ডিপার্টমেন্ট এর পরীক্ষা থাকলে কাম্পাসে যতবড় কনসার্ট ই থাকুক না কেন বা আমার ক্রাশ এর বার্থডে থাকলে ও আমাকে তখন পড়তে হবে। প্রচলিত একটি ফালতু কথা হলো হলো, মন যা চায় তাই করো বরং হওয়া উচিৎ যেটা করা দরকার সেটা ই করো। টু-ডু লিস্ট এ যা লিখবো তা দাঁতে দাঁত চেপে করবো। আজকে একটু অন্যথা করি, কাল ঠিক করে নিবো এমন ভাববো না। আমরা ফোনে ও টু-ডু লিস্ট লিখতে পারি ফোনের ক্যালেনডার এপ বা প্লে স্টোর থেকে গুগল ক্যালেনডার বা রিলেটেড এপ নামিয়ে নিয়ে।

- **ভোরে ঘুম থেকে উঠা:**

রেঁনেসাসের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি থেকে শুরু করে আজকের ওবামা, ওয়ারেন বাফেট, জেফ বিজোস, স্টিভ

জবস, বিল গেটস, রিচার্ড ব্রানসন, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো – বিশ্বখ্যাত ভোরের পাখিদের সবার নাম লিখতে গেলে এই লেখাতে ধরবে না। এ্যাপল এর বর্তমান সিইও টিম কুক, পেপসির সিইও ইন্দ্রা নূয়েই, ইউনিলিভারের সিইও পল পোলম্যান–সবাই ভোর ৪টার আগে বা সাড়ে চারটার মধ্যে ঘুম থেকে উঠে পড়েন।
ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত এক রিপোর্ট অনুযায়ী, এই সময়টা হল দিনের সবচেয়ে 'প্রোডাক্টিভ' সময়। কারন এই সময়টিতে বাইরের সমস্যা ও কোলাহল পুরোপুরি বন্ধ থাকে।

মিরাকেল মর্নিং বইয়ের লেখক হাল ইরোল্ড এর মতে, ঘুম থেকে উঠে আমাদের পার্থিব চিন্তা শুরু করার আগে অবশ্যই কিছুক্ষণ ধ্যান বা প্রার্থণা করা উচিৎ। এতে করে আমাদের মন অনেক শান্ত থাকে। জীবনের যা অর্জন, তার জন্য যদি আমরা দিনের শুরুতেই সৃষ্টিকর্তার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই–তবে মন অনেক ভালো থাকে, সেই সাথে অনেক বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে দিন শুরু করা যায়।[১][1]
আমাদের জন্য সকালের নাস্তা টা অনেক জরুরী। ঘুম থেকে দেরি করে উঠার কারণে আমরা প্রায় ই সকালের নাস্তা না করে ই ক্লাসে বা কাজে যাই এবং রীতিমতো

[1] loraku.com/সফল মানুষের রুটিন।

ঝিমাই, কাজ যতোটা ভালো হতে পারতো ততো টা হয় না। সকালে পেট পুরে নাস্তা আমাদের সারাদিন এনার্জি দেয় এবং মনকে চাঙ্গা রাখে।
সকালে ঘুম থেকে উঠার জন্য অবশ্যই রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া উচিৎ। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠতে এলার্ম হাতের কাছে না রেখে, যেন উঠে যেয়ে বন্ধ করতে হয় এমন জায়গায় রাখা উচিৎ। এছাড়া ও ব্যাবহার করতে পারি ফাইভ সেকেন্ড রুল।

- **ফাইভ সেকেন্ড রুল:**

"দ্যা ফাইফ সেকেন্ড রুল" বইয়ের লেখিকা মেল রবিন্স এর মতে, যদি কোনও কাজ করার কথা মনে আসে, তবে সেটা ৫ সেকেন্ড এর মধ্যে শুরু করতে না পারলে আপনার মস্তিষ্ক আপনাকে সেই কাজ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করবে। মনের মধ্যে নানান রকম অজুহাত তৈরী হয়।লেখিকা বলেন, “যদি কোনও জরুরী কাজের কথা মনে হয়,যেটা একটু কঠিন, আপনাকে ৫-৪-৩-২-১ গুনে সাথে সাথে কাজটি করার উদ্দেশ্যে জায়গা ছেড়ে নড়তে হবে–না হলে আপনার মস্তিষ্ক বেশিরভাগ সময়েই আপনাকে থামিয়ে দেবে”। যখনই কোনও প্রয়োজনীয় কাজের কথা মনে পড়বে বা কোনও প্রয়োজনীয় কাজ

করার সময় আসবে–তখন ৫ থেকে এক পর্যন্ত গুনবো এবং ১ গোনার সাথে সাথে কাজ শুরু করে দিবো। যেমন: সকালে এ্যালার্ম শোনার সাথেসাথেই ৫ থেকে ১ গুনবো এবং ১ গোনার সাথেসাথে বিছানা থেকে উঠে পড়বো। এক সেকেন্ডও দেরি করবো না। মেল রবিন্স লিখেছেন, "নিজেকে দিয়ে ছোট ছোট এ্যাকশন নেয়াতে নেয়াতে এর একটা চেইন রিএ্যাকশন সৃষ্টি হবে, আপনার আত্মবিশ্বাস ও প্রোডাক্টিভিটি বাড়তে থাকবে"।[২][2]

- **Pomodoro টেকনিক:**

পমোডোরো টেকনিক একটি টাইম ম্যানেজমেন্ট পদ্ধতি যা ১৯৮০ এর দশকের শেষদিকে ফ্রান্সেসকো সিরিলো উদ্ভাবন করেন। এই পদ্ধতিতে একটি টাইমার ব্যবহার করে যে কোন কাজকে ছোট ছোট সময়ের ভগ্নাংশে ভাগ করে কাজটি সম্পন্ন করা হয়। সাধারনত প্রতি সময়ের ভগ্নাংশের দৈর্ঘ্য ২৫ মিনিট হয় এবং প্রতি ২৫ মিনিট পর পর ছোট বিরতি থাকে। সময়ের এই প্রতি ভগ্নাংশকে "পমোডরো" বলে যা ইতালীয় এক শব্দ যার অর্থ টমেটো।[৩][3] এই পদ্ধতিতে একটা ঘড়িতে ২৫ মিনিট এর জন্য এলার্ম সেট করে পড়তে বা কোন কাজ করতে বসবো। একদম

[2] melrobbins.com/the five elements of the second rule
[3] bn.Wikipedia.org/পমোদরো টেকনিক

পুলসিরাত
পুলের উপর দাড়ায় আছি মনে করো, পড়ে গেলেই জাহান্নামে। দুনিয়া উল্টায় যাক, দেখবো না। ২৫ মিনিট পর ৫ মিনিটের ব্রেক নিবো।(একদম ৫ মিনিটের বেশি নয়!)। এরপর আরেকটা Pomodoro!
প্লে স্টোর থেকে Pomodoro বা রিলেটেড এপ নামিয়েও এটা করতে পারি।

- **Extras :**

১."না" বলা শিখতে হবে। অসময়ে বন্ধুরা ডাকলে মাথা ব্যাথা,পেট খারাপ এসব বলে নিজের কাজে ফোকাস থাকতে হবে।
২.খুব বেশি কাজ একসাথে না করে কাজকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিতে হবে।
৩.সব ধরনের Time waster থেকে দূরে থাকতে হবে।
৪.সব কাজ নিজে না করে, কিছু কাজ অন্যকে দিয়ে করিয়ে নিতে হবে।
৫.নিজের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে।

প্রতিদিন ৩০ মিনিট/১ ঘন্টা Personal/ Spritual development এর জন্য রাখবো। সেটা হতে পারে ধর্মীয়, মোটিভেশনাল,সেল্ফ ডেভেলপমেন্ট বই পড়া বা মেডিটেশন।

রুটিনের একঘেয়েমিতা কাটাতে কিছু বিনোদনের ব্যাবস্থা রাখবো। ঠিকমত রুটিন পালন করতে পারলে পুরস্কার হিসেবে নিজেকে "ট্রিট" দিবো, কিছু গিফট দিবো বা কোথাও ঘুরতে যাবো। এটা অনেক কাজে দেয়, প্রমাণীত। আবার রুটিন ভঙ্গ করলে শাস্তি হিসেবে ওইবেলা না খেয়ে থাকা এবং কিছু টাকা সদকা করতে পারি। এতে শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকেই কস্ট হবে। নিজের উপর একটু কষ্টও চাপিয়ে নেওয়া হলেও-রুটিন ভঙ্গ করার শাস্তি হিসেবে এটা মেনে নিন!

মোঃ রাসেল সরকার
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কবিতা

বার বার সহস্রবার আমি মরেছি

শতবর্ষে শতবার হাজারবার
আমি মৃত্যুকে বুক পেতে নিয়েছি।
আমি তো মরেছি পৃথিবীর মায়ায় বারবার;
আমি মরেছি ট্রয়ের বিধ্বংসতায়,
জাতিপাতের অজ্ঞাতায়,
পানিপথের ময়দানে।
আমি মরেছি যুদ্ধের বাহানায়,
লুটপাটের শিকার সমাজের গর্বে।
আমি মরেছি ক্ষনিকের বাদশার শাসনে,
মরেছি মিরজাফরের কপটতায়,
সিরাজের রক্তের প্রতিটি ফোটায়,
আমি মরেছি ভালবাসার অবহেলায়।

গভীর সমুদ্রের জল আমায় ডুবাতে পারে নি,
অগ্নিগিরির লাভা আমাকে মৃত্যু উপহার দেয় নি,
তারপরও আমি মৃত্যুর স্বাদ গ্রহন করেছি;
একাত্তরে চেতনার ছিন্নবিচ্ছিন্ন মমতায়,
সাতবীরের বলিদানের মূল্যহীনতায়।

আমি ডুবে মরেছি অসহায়দের একফুটো চোখের পানিতে,
আমি মরেছি মিথ্যা অহংকারে জ্বলে উঠা আগ্নি পুড়িতে।

আমি মরেছি সন্তানের সামনে মায়ের লজ্জা কেড়ে নিতে দেখে,
মরেছি মেয়েশিশুর লজ্জাভরা দেহে হায়নার কামড়ে,
মরেছি রাক্ষসের দখলকৃত তনুর ক্ষত বিক্ষত অঙ্গে,
মরেছি ক্ষুধার জ্বালায় পথে পথে
বোনের শাড়ি মাটিতে লুটিয়ে পড়াতে,
আমি মরেছি যাদের তোমরা বেশ্যা বলো
তাদের লজ্জা অসহায় চোখের চাহনিতে।
প্রেমিকার উলঙ্গ স্থিরচিত্রে,
লাখো কপটদারী প্রেমিকের মুঠোফোনের জালের বাধায়,
আমি মরেছি।

আমি বারবার মরেছি,
ত্রি-লিঙ্গো খ্যাত কিন্নর সমাজের প্রতি তোমাদের অবেহেলা দেখে,
মরেছি বৃদ্ধার উপর তোলা হাতের আঘাতের স্পর্শে,
মরেছি এতিমের হকের মিথ্যা দাবিদারের কাছে,
মরেছি গুজবের বাহানায় পদ্মাসেতুকে তার অস্তিত্ব দিতে,
মরেছি আমি রাস্তায়-রাস্তায় বন্দরে-বন্দরে
শিশুর হাতে অস্ত্র দেখে।
আমি মরেছি।

বিষাক্ত সাপের বিষ আমার জীবন কেড় নিতে পাড়েনি,
বনের হিংস্র প্রাণী আমার নিশ্বাস উপহারে নেয় নি,
তারপরও অধিকার বঞ্চিত মায়ের নিশ্চুপ ভাষায়,
নির্যাতনে শিকার আমার বোনের কথায়,
নিয়মের জালে বাধা আমার ভাইয়ের অসহায়ত্বের হাহাকারে,
মাঠিতে লুটিয়ে পরা আমার বাবার চিৎকারে,
যুদ্ধের নামে জাতি নির্বংশ করার বেদনায়,
আমি মৃত্যুর সাধ গ্রহন করেছি বারেবারে।

আমি মানবতা;
বারাবার সহস্রবার হাজারবার
আমি মরেছি,আমি মরছি।
আকাশের বিশলতায় আমি
অহংকার আর কপটতার পাহাড় দেখছি,
যার ভারে আমার শ্বাস রুদ্ধ আজ
আমি বারবার এভাবেই মৃত্যুকে অলিঙ্গন করছি,
আমি মরছি মিথ্যার গুলিতে চড়ে।

তারপরও ফিরে আসি নিষ্পাপ কবির মায়ায় হেরে,
ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে তাদের হাত ধরে এই ভেবে,
আমি মানবতা,প্রায় প্রানহীন এ সমাজে।

মো রেজাউল করিম হৃদয়
১ম বর্ষ, গণিত বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মৃত্যু

জীবন মানে যদি হয়-
ক্রমাগত মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া,
তবে মৃত্যু মানে জীবনের সবচেয়ে স্বাভাবিক পরিণতি।
আপনার জীবন বর্ণাঢ্য হতে পারে,
কিংবা আপনার জীবন অনাড়ম্বর হতে পারে,
সে আপনি যেভাবেই জীবন কাটান
এই জীবন পাখি একদিন উড়ে যেতে বাধ্য,
পাখি উড়ে যেতে বাধ্য,তার আপন আলয়ে।

মৃত্যু মানে--
ভালোবাসার মানুষগুলোকে কিছু না বলেই
হয়তো হঠাৎ চলে যাওয়া।
পৃথিবীতে আমরা অনেক কিছুর উর্ধ্বে অবস্থান করতে পারি,
কিন্তু মৃত্যুর উর্ধ্বে আমরা কেউ নই।

রবি ঠাকুর যতই কবিতা আওড়াক,
তবুও এটাই সত্যি যে-
একবার চলে গেলে সকল খেলায় আপনি আর নেই,
রোজ প্রভাতে আপনি নেই কোথাও,

আর কোনোদিনই আপনি পারবেন না ফিরে আসতে।
আপনি পারবেন না আর কখনো
মায়ের হাতের কষা মাংসের ঝোল খেতে।
আপনি পারবেন না প্রিয়জনের পাশে বসে
সুন্দর একটা বিকেল উপভোগ করতে।
আপনি পারবেন না ছাদে বসে জোছনা বিলাসে মেতে উঠতে।
আপনি পারবেন না বলতে-
"বাবা, আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি।"

মানুষের মৃত্যু আসে হঠাৎ করেই,
খুব বেশি আচমকাই।
হয়তো আপনি সুযোগ পাবেন না
কারো থেকে ক্ষমা চাওয়ার,
কিংবা সুযোগ পাবেন না
কাউকে ক্ষমা করার।
হয়তো একবুক হাহাকার উপহার দিয়ে বিদায় নেবেন
আপনার প্রিয়জন।
কিন্তু তখনো মেলানো হবে না বহু না মেলা হিসাব,
ভাঙ্গানো হবে না ছোট বোনটার অভিমান,
কিংবা বেয়াদবির জন্য ক্ষমা চাওয়া হবে না
বড় ভাইটার কাছ থেকে।

হয়তো বা শেষ নিঃশ্বাসের আগে অভিমান ভেঙে
প্রিয়জনদের বলা হয়ে উঠবে না -"ভালোবাসি।"

যে দুনিয়ার মোহে
প্রিয়জনের সাথে বসে মিষ্টি করে দুটো কথা বলতে পারেননা,
সেই দুনিয়া আপনার জন্য কখনোই অপেক্ষা করবে না।
আপনার জন্য অপেক্ষা করবে
আপনার মায়ের আচল।
আপনার অপেক্ষায় অজস্র বিকেল কাটিয়ে দেবে
আপনার প্রেয়সী।
হয়তো আপনার সন্তান আপনার মায়ায় নির্ঘুম কাটাবে
বেশ কিছু বিশেষ রাত।
কিন্তু এতোসবের মাঝেও
আপনার বাড়ির কৃষ্ণচূড়া ফুটবে
তার নিজ নিয়মে।
প্রতিদিনকার মতো সূর্যও উঠবে তার আপন নিয়মে,
শুধু ডুবে যাবেন আপনি।

একবার ভেবে দেখুন--
পৃথিবীতে আপনার হাজার বিঘা জমি থাকতে পারে,
কিন্তু আপনার শেষ ঠিকানার জন্য
মাত্র সাড়ে তিন হাতই যথেষ্ট।

দুনিয়ায় আপনার কোটি কোটি টাকা থাকতে পারে,
কিন্তু আপনার শেষ কাজের জন্য এক হাজার টাকার একটি নোটই হয়তো যথেষ্ট।
পৃথিবীতে আপনি যত দামী গাড়িই ব্যবহার করুন না কেন
আপনার শেষ যাত্রার বাহন
সর্বোচ্চ এলুমিনিয়াম এর তৈরি একটি খাটিয়া।

তাই বলছি সময় খুব কম,
হয়তো যতোটা আপনি কল্পনা করতে পারছেন,
তারচেয়ে অনেক কম।
নিশ্চিত মৃত্য দিয়ে ঘেরা এই জীবনে
মোহের বশে প্রিয়জনকে ভুলে যাবেন না।
আজ থেকে জীবনের সব হিসাব মেলাতে শুরু করুন।
এখনো অনেক কাজ বাকী,
আমার,আপনার,আমাদের সবার।
প্রিয়জনের সাথে বসে জোছনা বিলাস করা বাকী,
কৃষ্ণচূড়ার রঙে মুগ্ধ হয়ে
একটা কবিতা লেখা বাকী।
সন্তানের পাশে বসে মিষ্টি করে
কিছু গল্প করা বাকী।
আপনজনদের সাথে
আনন্দের কিছু মুহূর্ত কাটানো এখনো বাকী।

জীবনের অপূর্ণ ইচ্ছেগুলোকে পূর্ণতা দেয়া বাকী।
এখনো বাকী প্রিয় মানুষগুলোকে বলা- "ভালোবাসি"।
কারো অনুরোধের ঢেকি আপনাকে গিলতে হবে না।
আপনি শুধু মনের কোণে সুপ্ত ভালোবাসাগুলোকে
প্রকাশ করতে শুরু করুন।

মনে রাখবেন--
আদমশুমারী তালিকায় হয়তো আপনি কেবল একটি সংখ্যা,
কিন্তু আপনার আপনজনদের কাছে আপনিই তাদের গোটা
পৃথিবী।
তাই চলে যাওয়ার আগে সুদ কষার অংক না কষে,
যোগের অংক কষুন,
কেননা দিনশেষে আপনি নিজেই তাদের জন্য একটা বিরাট
বিয়োগ চিহ্ন একে দিয়ে চলে যাবেন।

এস.এম.ইমরানুল হক
১ম বর্ষ, এমবিবিএস
খাজা ইউনুস আলী মেডিকেল কলেজ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

পদ্মা মেঘনা নিজ ধারায় বহমান
কোটি হৃদয়ে তুমি
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

স্বাধীন দেশে স্বাধীন প্রাণ
করেছো তুমি আমায় দান
এর পেছনে শুধুই তোমার অবদান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।।

সারা বিশ্বের বিশ্ব নেতা তুমি
মিশে আছো
আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকল প্রাণ
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

বাংলার চাষা,মুটে-মজুর
কেউ ছিল না তোমার পর

ছিল তোমার আপনের আপন
দু'হাত ভরে করেছো দান
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান।

মোঃ শাকিল
২য় বর্ষ, সংস্কৃত,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসিমুখ

স্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে গোটা শহর..
কোথাও কেউ নেই।
ব্যস্তময় শহরের যান্ত্রিক মানুষ গুলোর দেখা মেলা দায়,
তবু এক দল মানুষকে দেখা যায়
এখান থেকে ওখানে ছুটতে।
কেউ বা অসহায়ের পাশে দাঁড়িয়ে পেয়েছে স্বস্তি আবার কেউ
হতে এসেছে ত্রাণ নিয়ে হতে ক্যামেরায় বন্দি।
মোটেও নহে এটা বন্যা দূর্যোগ।
দু'হাত তুলে মুনাজাত ধরি স্রষ্টা তুমি দূর করো করোনা।
শহর হোক পরিপূর্ণ যান্ত্রিকহীন মানুষে।
ভালোবাসায় ঘেরা প্রেমিকের শহর কোথায় যেন অন্তীম লগ্নে।
তাদের আর দেখা হয় না ক্ষণে ক্ষণে।
তবু তাঁরা অবিচ্ছেদ্য মনের আকাশে।
অন্ধকার শেষে আলো আসবে ভেবে
মধ্যবিত্ত আজ কোথায় হারালো?
খোঁজ নেয় নি কেহ হায়!
তবুও রয়েছে তাঁরা লোক লজ্জার ভয়ে
অভাবে-অনাটনে হাসিমুখ।
এ যেন বেঁচে থাকার যুদ্ধ-সংগ্রাম।

যুদ্ধা ডাক্তার লড়ে যায়
কেউ বা অকালে প্রাণ হারায়।
তবু স্বপ্নবাজ স্বপ্ন দেখে,
মুখের মুখোস আকাশে উড়িয়ে
সতেজ নিঃশ্বাসে সবার হাসিমুখ।

মো: সাব্বির হাসান
ব্যবস্থাপনা বিভাগ
ইসলামিয়া সরকারি কলেজ, সিরাজগঞ্জ

পথ শিশুদের ইদ

ভাই চল,ব্যাগটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়ি আজ,
আজ আমাদের হাতের মুঠোয় অনেক অনেক কাজ।
ঈদের দিনে মাংস পেতে ধনীর বাড়ি যাব,
মাংস দিয়ে তুষ্টি করে পেট টি ভরে খাব।

তাদের কাছে হাত পাতি ভাই অনাহারীর ন্যায়,
কিছু কিছু ধনী মোদের দেয় ফিরিয়ে দেয়।
ফ্রিজের ভেতর মাংসগুলো সাজিয়ে ঘুচিয়ে রাখে,
বছরব্যাপী খায় আর মোদের উপোস রাখে!

কোরবানী কি ভুড়ি ভরে মাংস খাওয়ার নাম?
বৈষম্যের পাল্লায় বুঝি নেই আমাদের দাম।

মোঃ ইসমাঈল হোসেন
ফাইন্যান্স বিভাগ, ২০১৭-১৮ সেশন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

স্বপ্ন আমার জন্য নয়

কতকিছুই আগলে রাখার সাধ জাগে,
রাখতে আর পারি কই?
কত ইচ্ছা,কত শখের কবর আজ পরিত্যক্ত।
কত যে বাসনা ছিল,অপূর্ণই রয়ে গেল।
গভীর রাতে যখন কারো সাথে
একান্ত সময় কাটানোর ইচ্ছা পোষণ করেছি,
আমার ইচ্ছাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে,
তার প্রস্থান ঘটে সূর্য ডোবার আগেই।
একদিন স্বপ্ন দেখেছিলাম তার হাতে হাত রেখে
অনন্তকাল সীমাহীন এক পথে চলবো,
অভিশপ্ত এ মনের ইচ্ছা পোষণের ফলেই
সে পথ কানা গলিতে রূপান্তরিত হলো!
শুনশান রাস্তায় নিয়ন আলোয় তার মুখোমুখি বসবো বলে
যখনই স্বপ্ন দেখেছি,
ল্যাম্পপোস্ট ভাঙ্গার শব্দেই স্বপ্ন ভঙ্গ হলো!
দুজনে তাঁরা দেখবো বলে উত্তর আকাশে যখনই তাকাই,
পোড়া চোখে কেবল দেখি তারার পতন!

কখনো মনোরম পরিবেশে সময় কাটাবো কল্পনা করতেই
নিজেকে আবিষ্কার করি স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার কুঠুরিতে।
কখনো ভাবি সন্ধ্যায় ঝুম বৃষ্টিতে ভিজবো দুজন,
সেদিন বিদ্যুৎ চমকায়,বাজ পরে ছাই করে দেয় সব আশা!
মনের খাঁচায় যে পাখির উপস্থিতি কামনা করি,
সেখানে অকস্মাৎ শকুনের আবির্ভাব ঘটে,
হৃদয় খুবলে খুবলে খায়,রক্তক্ষরণ হয়।
প্রেমের দেবতার কাছে স্বর্গীয় প্রেম ভিক্ষা করেছিলাম,
সে আমার জন্য প্রেরণ করেছিলো নরকের অনল দগ্ধ পীড়ন।
স্পষ্টই বুঝে গিয়েছিলাম স্বপ্ন,ইচ্ছা,প্রেম কিছুই আমার জন্য নয়!
তাও শেষবারের মতো প্রতীক্ষা করেছিলাম তার উষ্ণ চুম্বনের জন্য!
সেই শেষরাতে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ আমার ওষ্ঠে মিলেছিলো।

মুমতা হেনা মীম
১ম বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মা

মা! মা মানে ভোরবেলায়
না ওঠলেই বকুনি,
সোজা পথে না হাঁটলে
শুরু হবে পিটুনি।

জীবনের প্রথম শিক্ষক তুমি
করেছো আদর-শাসন,
ভুল পথে দিয়েছি পা
করেছো তুমি বারণ।

দশ-মাস গর্ভে,প্রসববেদনা
সয়ে গেলে হাসি মুখে।
অসুস্থ হলে ঘুম আসেনা
দুঃখিনী মায়ের চোখে।
মোদের মঙ্গল কামনায়
তুমি থাকো দিবা-রাত,
জ্বালা-যাতনা সহ্য করো
করোনা কখনো প্রতিবাদ।

হাসির আড়ালে কষ্ট লুকিয়েছো
দেখেছি আমি বারংবার,
ঠিক আছি,কিছু হয়নি
মিথ্যে বলেছো শতবার।

তোমার দীক্ষায় করেছি
সত্যকে বুকে ধারণ,
নীতি-ন্যায়ে অবিচল থেকে
বেঁচে থাকবো আজীবন।

শয়নে-স্বপনে অনুভবে শুধু
তোমার স্পর্শের হাত,
তোমার তরে সকল সুখ
তোমার পায়ে জান্নাত।

কায়েস মাহাবুব (সাকিব)
২য় বর্ষ, ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সায়েন্স,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেই শহর

স্বপ্ন রাঙা প্রভাতে,আমি আজো বসে আছি সেইখানে।
দূরবিনে চোখ রেখে,আজো তাকিয়ে আছি তোর পানে।
জানালার গ্রীলে হাত রেখে,আজো দেখছি তোর চলে যাওয়া।
নাটায়ের ঘুড়ি হয়ে,
আজো উড়ার বৃথা চেষ্টা করছি তোর আকাশে।

কোনো এক গাছের তলে,
আজো খেই হারিয়ে ফেলছি তোর নিশ্বাসে।
সকালের শিউলি ফুল হয়ে,
আজো পড়ে আছি অবহেলিত মালা গাথবি বলে।
সাহিত্যিকের লেখা প্রতি পংক্তিতে,
আজো মিশে আছি ছুয়ে দিবি বলে।
পথের ধারে শিশির বিন্দু হয়ে,
আজো আছি পথ চেয়ে।
যদি আবার আসিস তুই স্মৃতি গুলো রাঙাতে,এ শহরে।

মোঃ সাইমুম করিম
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

পাখির সংসার

ছোট কুঁড়ে ঘরে বাঁধি নতুন ঠিকানা,
ছোট ছোট পাতা এনে বিছাই বিছানা।
ছোট ছোট শিশু নিয়ে বাঁধি সেই ঘর,
ছোট প্রজাপতি ধরি ঠোঁটের ভেতর।

দেখিতে শিশুর সুখ নিশিদিনভর,
ঠোঁটের আধার দেই ঠোঁটের ভেতর।
ছোট ছোট পাখা মেলে জড়িয়ে আমায়,
কিচিরমিচির সুরে গাইয়ে শুনায়,
"তুমি যদি না থাক মা,কারে কাছে পাব?
কার মুখের খাবার নিজে নিয়ে খাব?
কে এত বাসিবে ভালো তোমার মতন?
কার মুখ দেখে মোরা জুড়াব নয়ন?
বড় ভালোবাসি,ও মা,বড় ভালোবাসি!"
আমিও তোদের বুকভরে ভালোবাসি।

মোঃ ইসমাঈল হোসেন
ফাইন্যান্স বিভাগ, সেশন:২০১৭-১৮
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মৃত্যু উপত্যকা

হাজার বছর ধরে ছুটে চলেছি মৃত্যু উপত্যকায়,
দৈনিক শত মায়ের আহাজারি,
জানান দেয় পৌছে গেছি সে ঠিকানায়।
কাল সাগর,রুনি,নুসরাত
আর আজ আবরার,
মৃত্যুর উল্লাস ধ্বনি তুলে হায়নাদের জয় জয়কার।
এ মোর শান্ত শিষ্ট সোনার বাংলায়,
আর কত খালি হবে
হাজারো বুক অঝোর কান্নায়?
চারিদিকে জমেছে দেখ হাজারো লাশের স্তূপ,
গন্ধ মোর নাকে লাগলেই অপেক্ষা মৃত্যুর কূপ।
তারা হায়েনা,তারা খুনি,তারা ধর্ষক
তুমি,আমি,আমরা নীরব দর্শক।
আমার মাথায় ভর্তি শিক্ষা,
হৃদয়ে কোন শিক্ষা নাই।
ডিগ্রিধারী মানুষ আমি
মনুষ্যত্বের বড্ড অভাব ভাই।

হায়না রুখতে আমরা যদি হই বৃথায়,
শুভেচ্ছা স্বাগতম তোমাকেও এ মৃত্যু উপত্যকায়।
আজ সে,কাল আমি,পরশু তুমি,
একে একে লাশে ভারী হবে
মৃত্যু উপত্যকার রক্তাক্ত ভূমি।

মোঃ মাহবুবুর আলম
ভেটেরিনারি অনুষদ,
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

কথামালা

সঠিক জায়গায় বললে কথা
সেটা হয় কাজের কথা,
জায়গা ঠিক না হলে হয়
ছোট মুখে বড় কথা।
রাষ্টপ্রধান বললে কথা
তা হয়ে যায় গুলির কথা
চুনোপুঁটি বললে কথা
সে হয়ে যায় কথার কথা।
মিঠা কথা তিতা হয়
স্বার্থে দিলে আঘাত
আদবের কথা বেয়াদবি হয়
থাকলে তাতে প্রতিবাদ।
সোজা কথা বাঁকা হয়
ভালোবাসা না থাকলে,
পুরান কথা নতুন হয়
পাওনাদার দেখলে।
হালকা কথা ভারী হয়
মনে দিলে ব্যথা,
রুক্ষ কথাও বাহবা পায়
বক্তা হলে নেতা।

শুকনো কথায় ভিজে না চিড়া
সে তো জানা কথা,
কারও মুখের কথায় মিলছে চাকরি
নয় খেলা কথা!
সহজ কথা কঠিন লাগে
কথায় থাকলে প্যাঁচ,
ভাবনার কথাও সত্যি হয়
জিতে গেলে ম্যাচ।
সস্তা কথা দামি হয়ে যায়
বললে মানী লোক,
ঠান্ডা কথা গরম লাগে
মাথায় থাকলে রাগ।
ন্যায্য কথাও উড়ো কথা হয়
সমর্থন না পেলে,
কিচ্ছার কথাও সমাদর পায়
টাকার কথা এলে।
কাঁচা কথা পাকা হয়
সব কথা শুনে,
রাগের কথা পানি হয়ে যায়
নারীর কথার গুণে।
জনের কথা মনের কথা
হলো অনেক কথা,

দুঃখের কথা কি বলব আর
সে অনেক কথা।
গানের কথা প্রাণের কথা
কথায় কথা আসে,
কথায় হাসি কথায় কান্না
কথায় ভালোবাসে।
কানে কথায় বিশ্বাস নেই
বেশি কথায়ও নয়,
বিস্তর কথা বলতে গেলে
মিছার মিশ্রণ হয়।
গাছের কথা ফুলের কথা
অনেক কথাই হয়,
আসল কথা কেউ বলে না
কথায় কাজে অমিল রয়।
কম কথা কম বিপদ
জ্ঞানীলোকেরা কয়,
তাইতো যাঁরা বুদ্ধিমান
শান্তই বেশি রয়।

লিটন আকন্দ
৩য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়

আকাঙ্ক্ষা

আমার কাঁকড়ার ঠ্যাংয়ের মতো
হাতের লেখা দিয়ে চিঠি লিখে তোমায় প্রেম নিবেদন করবো?
নাকি সামনে এসে কম্পন সুরে
তোতলাতে তোতলাতে ভালবাসি বলবো?

তোমার সাথে প্রথম আলাপনে কি শুনতে চাও?
ভালবাসি?
তুমি সুন্দর?
নাকি প্রিয়তম বলে ডাক?
কি চাও তুমি,বলো?
"ভালবাসি"
এই কথাটা প্রথমে তুমি বলতে চাও?
নাকি আমার থেকে শুনতে চাও?
কি চাও বলো?
কি চাও তুমি?

বর্ষার কদম ফুল
নাকি বৃষ্টির দিনে হাতে হাত রেখে পথচলা?
খোপায় ফুল গেঁথে দিবো?
নাকি শীতের দিনে গায়ে চাদর জড়িয়ে দিবো?

কুয়াশার দিনে কুয়াশা ভরা ঘাসে পা মিলিয়ে হাটবে?
নাকি নীল প্রজাপতির ডানা ধরতে
দু হাতের ছোঁয়া অনুভব করবে?
কি চাও তুমি,বলো।

দু'জন জড়াজড়ি ঘুমে মগ্ন হওয়া?
নাকি আমি ঘুমিয়ে গেলে আমার নিশ্বাস শোনা?
বলো,তুমি কি চাও?

কি চাওয়াতে তোমার আনন্দ?
কি পাওয়াতে তোমার ভাল লাগা?
বলো,
আমি যে একটু শুনতে চাই।

বিনিময়ে তেমন কিছুই চাই না
শুধু দেখতে চাই তোমার মুখের সেই মনকাড়া হাসি।
তোমার মায়াবী চোখের ওপর থিসিস করতে চাই।

যখন বুকে আগলে রেখে তোমাকে
মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবো।

তখন তোমার পাগল করা চুলের সুবাসে
মাতাল হয়ে যেতে চাই।
তোমার টমেটোর মতো গাল দেখে
তোমাকে টমেটো বিবি বলে ডাকতে চাই।
মাঝেমাঝে ঐ টমেটোর মতো গালকে আদর করে টানতে চাই।

কখনো কখনো আমার জন্য একটু সবুজ শাড়ি পড়ে কপালে
লাল টিপ দিয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে এসে,
একটু আদুরে গলায় "ওগো" বলে ডেকো
আর একটু একটু আড় চোখে তাকিয়ে লজ্জা পেয়ো
আমার লজ্জাবতী বউটা।

মোঃশাহাদত ইসলাম অনিক
ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
সেশন: ২০১৫-১৬
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেদিন লেগেছে ভালো

যেদিন তোমায় প্রথম দেখি,

সেদিন লেগেছে ভালো।

তখন থেকে আমার মন তোমায় চেয়েছিল।

পড়েছিলে যেদিন লাল জামা,ওগো মোর প্রিয়তমা,

হেঁটে যাচ্ছিলে ওই লম্বা পথ ধরে,

আমায় দেখে হেসেছিলে একটু আদর করে,

সেদিন লেগেছে ভালো।

তখন থেকে আমার মন তোমায় চেয়েছিল।

পথে-ঘাটে-মাঠে যেথায় দেখি

তোমার কাজল কালো ওই দুই আঁখি,

তখন আমার ইচ্ছে করে

তোমায় এ বুকের মধ্যে রাখি।

লোকান্তর ছেড়ে ওই দুর প্রান্তরে

ছোট্ট একটি ঘর বাঁধি।

সেদিন লেগেছে ভালো।

তখন থেকে আমার মন তোমায় চেয়েছিল,

এখনও তোমায় লাগে ভালো।

তুমি বলো না'গো তোমায় ভালবাসি

শুনতে আমার বড়ই ইচ্ছে করে,

তবে কি আমার স্বপ্ন মিথ্যে হয়ে যাবে চিরতরে?

সেদিন লেগেছে ভালো,

তখন থেকে আমার মন তোমায় চেয়েছিল।

আজও পথ চেয়ে রয়েছি তোমার আশায়

যেদিন বলবে তুমি,

ভালোবাসি তোমায়,ভালোবাসি তোমায়।

সোহাগ আলী

বিএসসি এবং এমএসসি

ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সাহসীকতায় আমরা

মোরা উদ্যম, মোরা সাহসী

মোরা নির্ভীক।

মোরা সাহস নিয়ে লড়তে রাজি নিত্তনৈমিত্তিক।

হও সাহসী, হও বীর

পারবে তুমি পারবে,

বিজয়ীর খেতাবে নাম তুলতে।

কিসে ভয়?কিসে বাঁধা?

মনে তুমি নাও বল।

বলো আমি পারব, আমি পারব

বিজয়ীর খেতাবে নাম তুলতে।

তোমায় দেখে বাংলার দামাল ছেলে

নিবে সাহস লড়বে যুদ্ধে

আর বলবে আমরাই পারব

বিজয়ীর খেতাবে নাম তুলতে।

রুনা আক্তার

২য় বর্ষ, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বৃষ্টির ছোঁয়া

অনেকদিন পর বৃষ্টি নেমেছে

আর এই বৃষ্টি ছুঁয়েছে আমার শরীর;

সেই মুহূর্তটা ছিলো ভালোলাগার;

কারণ তখন আমি তোমার স্পর্শ অনুভব করেছি।

হঠাৎ আবার বৃষ্টির ফোঁটা আমার ঠোঁট স্পর্শ করে;

তখন মনে হয় তোমার ঠোঁট

এসে মিশেছে আমার ঠোঁটে;

ঠিক তখনই তোমাকে আমার পাশে অনুভব করি।

হঠাৎ আবার পাগলামি ঠেকে মাথায়;

চোখ বন্ধ করে মুখ আকাশের দিকে করি;

চোখের চশমাটা ঘোলাটে হয়ে যায়;

ঠিক আমার আবছা ভবিষ্যতের মতো।

এমন বৃষ্টির দিনে সেই আগের বৃষ্টির কথা মনে পড়ে যায়,

তখন সময়টা একটু অন্যরকম ছিল;

তখন তুমি আমার পাশে ছিলে;

একসাথে, গাড়িতে হাতটা ধরে রাখতে আমার।

সত্যিই, এই স্মৃতিগুলো মনে পড়লে

মনের অজান্তে ঠোঁটের কোণে হাসি ফোঁটে।

তখন বৃষ্টিকে চিৎকার করে ধন্যবাদ জানাই।

আর আমার মন চিৎকার করে বলে,

"আমি ভালোবাসি তোমাকে,

হ্যাঁ,অনেকটা ভালোবাসি"।

ফাতেমা মিতু

১ম বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বন্ধু

আমি এমন একজন বন্ধু চাই-

যার কাছে-

আমার লুকানোর কিছু থাকবে না।

যার কাছে-

আমি আমার জীবনের,

প্রতিটি হেরে যাওয়া গল্প

নিঃসঙ্কোচে বলতে পারবো।

যার কাছে-

একটা বিষাক্ত অতীতের গল্প বলতে গিয়ে-

কান্না করা যাবে,

আমি এমন একজন বন্ধু চাই।

আমি এমন একজন বন্ধু চাই-

যে আমার, ভালো খারাপ সকল সময়ে পাশে থাকবে।

যে আমার-

সৃষ্টিশীল কাজে অনুপ্রেরণা হবে।

যে আমার-

একটা খোলা বইয়ের মতো হবে-

যার শুরু থেকে শেষ সবগুলো পৃষ্ঠাই

আমার জানা থাকবে,

আমি এমন একজন বন্ধু চাই।

মোঃ তছলিম উদ্দীন

ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ, সেশন-২০১৮-২০১৯

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

চেতনায় মা

ভালোলাগেনা চাঁদের আলো,

দূর আকশের নীল,

ভালো লাগেনা জোয়ার ভাটা,

শাপলা ফোটা বিল।

ভালো লাগেনা ঝরনা ধারা,

নদীর কলতান।

মনটা আমার দেখতে মাকে,

করে যে আনচাঁন।

মা যে আমায় হাঁটতে শেখায়,

শেখায় মুখের ভাষা,

আমার জন্য জমিয়ে রাখে,

অশেষ ভালোবাসা।

ভাবে শুধু আমায় নিয়ে,

থাকি যখন দূরে।

চেয়ে থাকে আমার পানে,

ফিরবো কখন ঘরে।

ছলছল দু'চোখ আমার,

শুধুই স্বপ্ন আঁকে,

যাবো কখন গাঁয়ের বাড়ি,

দেখবো কখন মাকে।

সবার কাছে দামি দামি অনেক জিনিস রই,

আমার কাছে দামি জিনিস,

মা ছাড়া কেউ নয়।

মোঃ মঞ্জুরুল করিম রুপম

১ম বর্ষ, ফার্মেসী বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইচ্ছা

একটা বিকেল পার করতে খুব ইচ্ছে করে

তোমার সাথে শান্তিনিকেতনে।

মুষল ধারে নয় হালকা গুড়িগুড়ি বৃষ্টি

তোমার সাদা শাড়িতে পড়ে

মুক্ত হয়ে ঝড়ে পড়বে তোমার সারা অঙ্গে।

আমার মনের আকাক্ষা গুলো

তোমার চুল নিঙড়ানো জলে নিচে গড়িয়ে পড়বে।

শুনেছি বর্ষায় আর বসন্তে শান্তিনিকেতন নতুন রুপে সাজে,

আমি আর তুমি না হয় সেই সৌন্দর্যে একটু ঘি ঢেলে দিবো।

গঙ্গার পাড়,শান্তির নির্মল বাতাস আর মাটির ভাঁড়ে

এক কাপ চায়ে চুমুক দিবো আমরা।

আর গঙ্গার ধারে তোমার আমার অভিমানি ভালোবাসা

চুমুর গল্পে মেতে উঠে বলবে ভালোবাসি,

ছেড়ে যাবো না কখনো।

এখন তোমার পছন্দের রং নীল বিষ হয়ে

ঝড়ে পড়ে গঙ্গার আকাশে বাতাসে।

গঙ্গা,শান্তিনিকেতন আর রবীন্দ্রনাথ বড্ড অপেক্ষা করছে

তোমার নীল বিষ কে মধু মাখা সুন্দর করার জন্য।

যাবে তো আমার সাথে গঙ্গার ধারে??

কামরুজ্জামান বিবেক

৩য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

কোন এক সময় পদ্মা নদীর তীরে

কোন এক সময় পদ্মা নদীর তীরে,
অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রই
ঐ ঢেউগুলোর দিকে।
ঢেউগুলো শত প্রতিকূলতার ভীড়ে,
সকল বাঁধা পেরিয়েই
ছুঁতে চায় আমাকে।

আচ্ছা ঐ ঢেউগুলো কি তুমি...?
আজ ঢেউয়ের বেশে
আমাকে পেতে এসেছো?
চিনেছি গো চিনেছি আমি,
আজও ভিন্নরূপে আমার কাছে
তোমার ছোঁয়া দিয়েছো।

তাই তোমার প্রেমে আজ আকাশ আমি,

যেন দূরের ঐ অলীক আকাশে

তুমি আমাতেই মিশেছো।

বিজয় পাল

১ম বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

গল্প

একটি পতাকা

রানু স্কুল শেষে বাসায় ফিরে সারা বাড়ি হোন্নে হয়ে খুঁজেও মাকে না পেয়ে ভ্যাবলাইকে নিয়ে কাঁঠাল তলায় বসে আছে। ভ্যাবলাই কে তার খুব পছন্দ। মন খারাপ হলেই সে ভ্যাবলাই এর সাথে গল্প করে।আজ তার সাথে গল্প করতেও রানুর ভাল লাগছে না। একে তো চৈত্র মাসের কাঠ ফাটা রোদ তার সাথে যোগ হয়েছে ভয়ঙ্কর রকমের ক্ষুধা। ভ্যাবলাই তার ভাগের দুধ সাবাড় করে উদর পূর্তি করে বসে আছে। হঠাৎ মার গলার আওয়াজ পেয়ে রানু দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় নালিশ করল। কোথায় ছিলে? ভাত দাও। রানু হাত ধুয়ে খেতে বসল। মাছের কাটা গুলো ভ্যাবলাইয়ের দিকে ছুড়ে দিয়ে সে হাত ধুয়ে শুয়ে পড়ল। খুব ক্লান্ত লাগছে তার তবুও সে ঠিক করেছে ঘুমাবেনা। বিকেলে রহিমাদের উঠোনে পুতুল খেলতে যেতে হবে যে তার।কিন্তু সে ইচ্ছে পূরণ হল না। কখন যে চোখ দুটো হাল ছেড়ে দিয়েছে সে বুঝতেই পারেনি। ভ্যাবলাই এর মিউ মিউ আওয়াজে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই তার মনটা খারাপ হয়ে গেল। যদিও সে এই তিন কাটার খেলা খুব একটা বোঝেনা কিন্তু কাটা গুলোর অবস্থান দেখে সময় আন্দাজ করতে পারে। সে নিজের ভাষায় ভ্যাবলাই কে আচ্ছা মত বকে দিল। কেন তাকে আগে ডেকে দেয়নি। চোখ মুছতে

মুছতে সে মার পাশে গিয়ে বসল। আজান শেষ হল, দূরে কোথাও শাঁক বেজে উঠল। ও তার সন্ধ্যে বেলায় খাওয়ার অভ্যাস টা ঠিক রেখে পড়তে বসেছে। ওদের বাংলার মাস্টারমশায় বেশ কড়া মানুষ। পূর্বে মাস্টারমশায়ের ভয়ে পড়তে বসলেও এখন বাংলা গল্প গুলো পড়তে তার বেশ ভাল লাগে।মাস্টারমশায়কেও এখন খুব ভাল লাগে রানুর। কত কিছুই না শিখেছে তাঁর কাছে। পড়া শেষ করে সে মায়ের আঁচলের ফাঁকে মুখ গুজে দিয়ে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে বাবার কথা ভাবছে।বাবা থাকতে সে বাবার কাছে ঘুমাত। বাবার কাছে গল্প শুনত। কখনও রূপকথার গল্প, কখনও ভূতের গল্প আবার কখনও শুনত নতুন ধরনের গল্প যেমন ভাষা আন্দোলনের গল্প, মুক্তি সংগ্রামের গল্প। এই নতুন ধরনের গল্পের জটিলতা তার সরল মস্তিককে স্পর্শ করতে ব্যর্থ হলেও তার কোমল হৃদয়কে ঠিকই স্পর্শ করত। কে জানে, হয়ত ছোট্ট রানুর মনে মুক্তির বীজ বপণের আশায় তার বাবা তাকে গল্প গুলো শুনাত। ছয় মাস হল রানুর বাবা জেলে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ নেওয়ায় স্বৈরাচারী শাসকের পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে।পরদিন খুব ভোরে রানুর ঘুম ভেঙ্গেছে। সে উঠানে একা একা বসে আকাশ দেখছে। আসন্ন কাল বৈশাখীর মেঘে আকাশটা কাল হয়ে এসেছে। মেঘগুলোর কাছে দিনের সূর্য্টা হার মেনে গেছে। রানু কোথাও সূর্য মামাকে দেখতে পেল না। মনে হচ্ছে যেন দিনকে রাতের আধাঁর গ্রাস করে নিয়েছে। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের আলোয়

চারিদিক আলোকিত হয়ে এলো। দূরে কোথাও যেন আকাশটা ভেঙ্গে পড়ল। রানু ভয়ে উঠান থেকে এক দৌড়ে বাড়ির ভেতরে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুশুলধারে বৃষ্টি শুরু হল। রানুর উঠানে যেতে ভয় করছে। কিন্তু তার বৃষ্টি দেখতে খুব ভাল লাগে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভ্যাবলাই এসে মিউ মিউ আওয়াজ করে তার গায়ে গা ঘেষতে লাগল। রানুর সাহস হল, সে ভ্যাবলাই কে সঙ্গী করে উঠানে গিয়ে বসল। ঝড়ো বাতাসে বয়ে আসা মৃদু বৃষ্টির ঝাপটা তার ভালই লাগছে। ঝড়ো বাতাসে লম্বা লম্বা গাছ গুলো যেন একই তালে নৃত্য করছে। নীলুদের বাড়ির পাশের সুপারি গাছটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এখনি ভেঙ্গে পড়বে। চোখের কোনে কিছু একটার নড়াচড়া তার দৃষ্টিটাকে গাছের মগডাল থেকে সোজা মাটিতে নিয়ে আসল। কয়েকটা কুনোব্যাঙ বৃষ্টির ছোঁয়ায় আনন্দে মেতেছে। একত্রে গলা ফাটিয়ে গান গাইছে। দূরে ক'জন ছেলে মেয়ে বৃষ্টিতে গোসল করছে। রানুর ও খুব ভিজতে ইচ্ছে করছে কিন্তু গতবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে বৃষ্টিতে ভিজে কি আসুখটাই না বাধিয়েছিল তা সে ভোলেনি। তিন দিন জ্বরে বিছানা থেকে উঠতে পারেনি। বৃষ্টি থামার কোন নাম নেই। আজ তার আর স্কুলে যাওয়া হবেনা ভেবে তার মনটা খারাপ হয়ে আসল। সারাদিন বৃষ্টি হল।রাতেও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি পড়ল। সকালে আকাশ ফাঁকা হয়ে এসেছে। সে যথারীতি স্কুলে যাওয়ার পথে রহিমাকে সাথে নিয়ে রওনা দিল। কাদামাখা রাস্তা পেরিয়ে

যখন তারা স্কুলে পৌঁছল তখল ক্লাস শুরু হয়ে গেছে। তারা

চুপিসারে ক্লাসে ঢুকে মাস্টারমশায়ের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পেছোনের সারিতে গিয়ে বসল। মাস্টারমশায় বই খুলে সামনে রেখে দিয়ে বলতে শুরু করলেন দেশের অবস্থা নাকি ভাল নয়। সকলকে সাবধানে থাকতে বললেন। মিলিটারিরা নাকি অত্যাচার শুরু করেছে, দেশে লুটপাট করছে। ১৯৫২ সালে রফিক,শফিক,জব্বার প্রান দিয়েছে দরকার হলে আমরাও দেব, এই দেশটা আমাদের। এসব বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। পরক্ষণেই তিনি নিজেকে সামলে নিলেন এই ভেবে যে এদের বয়স এসবের উপযুক্ত নয়। কিন্তু রানু ঠিকই বুঝল। বাবার কাছে রফিক, শফিক, জব্বার এদের গল্প কতবার শুনেছে সে। মাস্টারমশায় শুধু যেন তার বাবার বপণ করা সেই স্বাধীনতার বীজকে অংকুরিত করলেন। মাস্টার মশায়ের একটা কথা তার খুব মনে ধরেছে, এই দেশটা আমাদের। নীলুর সাথে ঝগড়া হলে সে বলে তাদের বাড়িটা নাকি নীলুদের জায়গার উপরে, নীলুর বাবা নাকি তাদের থাকতে দিয়েছে। সে মনে মনে ঠিক করল, নীলু যদি আবার এ কথা বলে তাহলে সে বলে দেবে যে ওই জায়গাটা শুধু তাদের নয়, এই পুরো দেশটাই তাদের, আমাদের সবার। হয়ত তার সরল মস্তিস্ক এই জটিল বাক্যটিকে এভাবেই সরল করে নিয়েছে। হয়ত বা তার কোমল হৃদয় এভাবেই তার

অজান্তেই তার দেশটাকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। ক্লাসের নিরবতা ভেঙ্গে রাকিব প্রশ্ন করে বসল, পৃথিবীটা কি গোল মাস্টার মশায়? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আর হঠাৎ ছুটির ঘন্টা

পড়ে গেল। রানু বাড়ি ফিরছে আর ভাবছে পৃথিবী কিভাবে গোল হতে পারে? পাশেই সে একটা মৃদু আর্তনাদ শুনতে পেল। চোখ পড়তেই সে দেখলো একটা বিড়াল ছানা গাড়ির চাকার নিচে পিষ্ঠ হয়ে পড়ে আছে। রাস্তায় রক্তের ছোপ ছোপ দাগ। সে তাড়াতাড়ি বাসায় এসে ভ্যাবলাইকে খুঁজতে লাগল। ঘরের এককোণে ওকে পেয়ে কোলে তুলে নিল। এর দুদিন পরই গ্রীষ্মের ছুটিতে স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। এখন সে ভ্যাবলাইকে চোখে চোখে রাখে।

আজ ৭ জুন, ১৯৭০

রানুর জন্মদিন। মা তাকে লাল টুকটুকে চুড়ি কিনে দিয়েছে। ওগুলো পরেই সে স্কুলে এসেছে। মাস্টারমশায় আজ ক্লাসে নতুন কিছু একটা দেখাবেন বলেছেন। তাই সবাই অধীর আগ্রহে বসে আছে। তিনি ক্লাসে ঢুকে সবাইকে বসতে বলে তার ব্যাগ থেকে কি জানি একটা বের করে উপরে তুলে ধরলেন। রানু দেখল একটা সবুজ কাপড় যেটার মাঝখানে কি সন্দুর লাল রং করা

ঠিক যেন তার চুড়ির রং। এটা নাকি তার দেশের পতাকা, গতকালই নকশা আঁকা হয়েছে এটার। মাস্টারমশায় যখন বললেন, যে এই দেশটাকে ভালবাসে সে এই পতাকাকেও ভালবাসে, এর কোন অসম্মান হতে দেয় না। রানু তখন কোন দেরি না করে তার সবচেয়ে প্রিয় খাতাটার এক পাতা জুড়ে পতাকার নকশা এঁকে নিল। রানু মনে মনে ভাবছিল কে এত সুন্দর পতাকা তৈরী করেছে, কেনই বা বৃত্তটার রং তার হাতের চুড়ির সাথে মিলে গেল। সে বারবার লাল বৃত্তটার সাথে তার চুড়ির রংটাকে মেলানোর চেষ্টা করছিল। পতাকাটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। সেও একটা বানাতে চায়।

হঠাৎ কোন অজানা কারণে রানুর স্কুল বন্ধ হয়ে গেল। দূরে কোথাও খেলতে যাওয়াও তার নিষেধ। রানুর আর বন্দি থাকতে ভাল লাগেনা। মাঝে মাঝে সে জানালা দিয়ে দেখতে পায় অনেক মানুষ জয় বাংলা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সেও মাঝে মাঝে বুঝে না বুঝে তাদের সাথে জয় বাংলা বলে ওঠে। সারাদিন ভ্যাবলাইয়ের কোন দেখা নেই, রানু সুই সুত নিয়ে সেলাই করতে বসেছে। সেলাই করা সে নীলুর কাছে শিখেছে। আগে পুতুলের জামা সেলাই করত আজ পতাকা সেলাই করছে। কোথা থেকে যেন দুই টুকরা লাল আর সবুজ কাপড়ও জোগাড় করে নিয়েছে। দুদিনের প্রচেষ্টায় সে যেনতেন ভাবে একটা পতাকা

বানিয়ে ফেলেছে। একটি লম্বা লাঠির মাথায় সেটিকে বেঁধে বাড়ির উঠান থেকে একটু দূরে উঁচু করে রেখেছে যেন সবার চোখে পড়ে। রোজ সে পতাকাটা দেখে আসে। বাতাসের ছোঁয়ায় যখন সেটিতে ঢেউ খেলে তখন সে একদৃষ্টে চেয়ে তার সৌন্দর্য উপভোগ করে।

রানু বাইরে রহিমার মার গলার আওয়াজ পেল। দেখলো তার মাকে কিছু একটা বলে রহিমাকে নিয়ে দৌড়ে চলে গেল রহিমার মা।রানুর মাও দৌড়ে এসে একটা ময়লা ব্যাগে হালকা হাওয়া দিয়ে জামা কাপড় তাতে ভরতে লাগল। রানুকে বসে থাকতে দেখে তাকে মুড়ির কৌটটা আনতে বলল। তাদের নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে। সে মাকে বলল কোথায় যাবে তারা। তার মা কাঁদোকাঁদো কণ্ঠে বলল, এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে মা। রানু মনে মনে ভাবতে লাগল এ বাড়িটার মত দেশটাও কি তাদের নয়। তাহলে কি মাস্টারমশায় মিথ্যে বলেছিলেন। তার মা তার হাত ধরে হেচকা টান দিয়ে দ্রত হাঁটা ধরল। হাঁটতে গিয়ে রানুর মনে পড়ল সে তার পতাকাটা ফেলে এসেছে। সে উঠানের দিকে দৌড় দিল। লাঠির মাথা থেকে পতাকাটা খুলে নিল। হঠাৎ গুলির শব্দে আকাশ কেঁপে উঠল। চারিপাশে গুলির বৃষ্টি শুরু হল। একটা গুলি এসে লাগল তার পায়ে। যন্ত্রণায় সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। রানু উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করতেই আরেকটা গুলি তার বুক ফুঁটো করে বেরিয়ে গেল। তার শরীর থেকে ঝরে পড়া রক্তে মাটি লাল হয়ে উঠল। তার দেহটা শেষ একটা কাঁপুনি দিয়ে

নিস্তেজ হয়ে গেল। তার হাতটা মাটি আকড়ে ধরার বৃথা চেষ্টা করে চিরদিনের মত থেমে গেল। যেন তার আত্তা দেহ ত্যাগ করলেও এ মাটিকে আঁকড়ে ধরে এখেনেই থেকে যেতে চায়। এ দেশ যে একান্তই তার, এ মাটিতে রয়েছে তারই অধিকার।

রায়হানুল ইসলাম শাকিল
২য় বর্ষ, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভ্রমণকাহিনী

লঞ্চ যাত্রা

বরিশালের সাদেকপুরে নতুন লঞ্চঘাট হওয়াতে আমার জন্য ভালো হয়েছে। বাসা থেকে কাছেই, হেটে যেতে ৩০ মিনিট লাগে। সমস্যা হলো ঠিক মতো রিক্সা পাওয়া যায় না। বড় বোন ঢাকা থাকে তার কাছে যাবো। লঞ্চ ছাড়বে বিকেল ৫ টায়। আমি ৩ টা বাজে রওনা দিলাম, সাথে একটা স্কুল ব্যাগ তার ভেতর আমার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র। আর একটা ছোটো ব্যাগে একটা বিছানা চাদর, আর কাথা। কোনো রিক্সা পেলাম না তাই হেঁটে হেঁটে লঞ্চঘাট পৌঁছাইলাম ৩ঃ৪০ মিনিট এ।

৪ তলা লঞ্চ টা মোটামুটি বড়োই। লঞ্চের স্টাফরা যাত্রীদের কে ডেকে ডেকে লঞ্চে উঠাচ্ছে। টার্মিনাল থেকে লঞ্চে উঠার জন্য একটা সিঁড়ি দেওয়া আছে। সেই সিড়ি দিয়ে ছোটো ছোটো পায়ে এগুচ্ছি, সাঁতার তেমন একটা পারি না, পা পিছলে নদীতে পরলে পানিতে ডুবে যেতে হবে। যদিও আমি গ্রামে বড়ো হয়েছি কিন্তু গ্রামের ছেলেদের কোনো বৈশিষ্ট্য আমার মধ্যে নেই। গ্রামের ছেলেদের নদীতে সাতার কেটে শৈশব কাটে। উঁচু লম্বা সাঁকো মুক্ত হাতে পার হয়। আর আমি সামান্য লঞ্চের সিড়ি পার হতে হাঁটু কাপাকাপি শুরু হয়ে গেছে। আমার পিছনে যাত্রীদের ঠেলাঠেলি লেগে গেলো। আমি কোনোরকম সিঁড়ি পাড় হয়ে ভেতরে ঢুকলাম।

লঞ্চে ভেতর অনেক জায়গাই খালি পরে আছে, কিন্তু আমি কোথায় বিছানা করবো বুঝতে পারছি না। লঞ্চে খোলা ফ্লোর থাকে, একে ডেক বলে, ডেকে জন প্রতি ভাড়া ২০০ টাকা। ডেকের সিস্টেম টা হলো যে যেখানে বিছানা করবে সেই জায়গা তার দখলে। মজার ব্যাপার হলো জায়গা দখল করার পর সেখানে এমন এক পরিবেশ তৈরি করে যেন ঐ জায়গা এক জীবনে তার অথচ সকাল হলেই সব গুটিয়ে চলে যাবে। আমি কোথাও বিছানা করলাম না। ব্যাগ ২ টা একটা খুঁটির সাথে রেখে দিলাম। ব্যাগে জামাকাপড় ছাড়া তেমন মূল্যবান কিছু নেই, তাই চোরে নিয়ে গেলেও আফসোস নাই।

নতুন লঞ্চ তাই সব ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম। লঞ্চের নিচ তলার পিছনের দিকে অর্ধেক জায়গায় জুড়ে ইঞ্জিন ঘর, বাকি অংশ ডেক। ইঞ্জিন ঘরের চার পাশে লোহার গ্রিলের বেড়া। তার পিছিয়ে রান্না ঘর, আর সর্বশেষে টয়লেট। ২য় তলায় সম্পূর্ণ ডেকে যাত্রীদের জায়গা দখল করার জন্য রাখা হয়েছে। ৩য় তলায় সব কেবিন(হোটেলের মত রুম)এবং রেস্টুরেন্টে। ৩য় তলার উপরে লঞ্চের সামনের অর্ধেক পর্যন্ত ৪র্থ তলা বাকিটা খোলা ছাদ। ৪র্থ তলা মূলত সারেং(লঞ্চের ড্রাইভার)এবং যারা লঞ্চের স্টাফ তাদের জন্য। ৪র্থ তলার ছাদের উপর নামাজের জায়গা। আমার পুরো লঞ্চ টা ঘুরে দেখা শেষ। কিন্তু কেবিন গুলোর ভেতরে দেখতে পারলাম না। এর মধ্যে একটা স্টাফ এসে

জিজ্ঞেস করলো স্যার কেবিন লাগবে? তার বয়স ৪০-৪৫ হবে, মুখ ভর্তি করা পান। পান চিবাচ্ছে আর আমার দিকে তাকিয়ে আছে উত্তরের আশায়। আমি কিছু বললাম না মুচকি হাসলাম, যার অর্থ ধরে নিয়েছে আমার কেবিন লাগবে। সে বললো চলুন আপনাকে কেবিন দেখাই। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে চলুন। মনে মনে ভাবলাম এ তো মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি।

লোকটা আামকে এক এক করে সব গুলো কেবিন দেখালো। প্রথমে নিয়ে গেলো সিঙ্গেল কেবিনে, ভাড়া ৮০০ টাকা। এই কেবিনে একটা বেড, ছোট্ট একটা ওয়ারড্রব, ফ্যান, মোবাইল চার্জ দেয়ার ব্যাবস্থা। এর পর নিয়ে গেলো ডাবল কেবিনে ভাড়া ১৪০০ টাকা। এই কেবিনে শুধুমাত্র একটা বেড বেশি বাকি সব সিঙ্গেল কেবিনএর মতই। তার পর গেলাম স্পেশাল কেবিনে বেড টা বড়, এক সাথে ২ জন ঘুমানো যাবে ভাড়া ১২০০ টাকা। যারা কেবিন নেয় তাদের জন্যে আলাদা ভালো মানের টয়লেট থাকে। এর পর দেখালো ভি.আই.পি কেবিন, সিঙ্গেল কেবিনের ভাড়া ২০০০ টাকা, ডাবল কেবিন ২৮০০ টাকা। এই কেবিন গুলোকে পাঁচ তারকা হোটেলের সাথে তুলনা করা যায়। এই কেবিনে এসি এবং সংযুক্ত বাথরুম রয়েছে। সব কেবিন দেখানোর পর বললো আপানার কোনটা লাগবে? আমি বললাম একটাও লাগবে না।
সে বললো, তাহলে এতোক্ষণ দেখলেন কেনো? আমি বললাম, আমি তো দেখাতে বলি নাই, আপনি দেখাতে চাইলেন তাই

দেখালম। মুরুব্বি মানুষ তা না হলে তো মনে কষ্ট পাবেন। লোকটি বোকার মতো আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেলাম।

লঞ্চ ইতমধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। ব্যাকগিয়ার দিয়ে লঞ্চটাকে ঘুরাবে কিন্তু স্রোতের টানে নদীর পাড় ঘেষে পিছনের দিকেই চলতে শুরু করলো। লঞ্চ সারেং এর কন্ট্রোলের বাহিরে চলে গেলো। বুনো হাতি পাগলা হয়ে গেলে যেমন গাছপালা ভেঙে ফেলে লঞ্চ টা তেমনই পাড়ের সুপারি গাছ গুলো ভাঙতে লাগলো। আমি একটু ভয় পেলেও বাকি যাত্রীরা বেশ মজাই পাচ্ছে। কেউ কেউ আবার অতি বিরক্ত হয়ে সারেংকে গালাগালি করতেছে, কেউ আবার সমালোচনা করতেছে, সারেং নতুন তো তাই এমন হচ্ছে। একসময় সেই অনভিজ্ঞ সারেং লঞ্চটাকে তার কন্ট্রোলে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

লঞ্চ তার গন্তব্যে ছুটছে। আমি লঞ্চের একেবারে সামনে চলে গেলাম, হুহু করে বাতাস আমর চুল, জামাকাপড় পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। আমি চোখ বন্ধ করে হাত দুটো দুপাশে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি, মনে হচ্ছে আমি পাখির মতো আকাশে উড়তেছি। এই লঞ্চটা কে টাইটানিক এর মতো মনে হচ্ছে, আর আমি হলাম নায়ক জ্যাক কিন্তু আমার নেই নায়িকা ক্যাট। তাতে কি কল্পনায় আমি আমার নায়িকা কে নিয়ে আসলাম। প্রতিটি

পুরুষের কল্পনায় তার মনের মতো একটা নায়িকা থাকে, তাকে যখন ইচ্ছে কল্পোনায় আনা যায়। বেশিক্ষন আর আমার নায়ক জ্যাক হয়ে থাকা গেলো না কারণ নায়িকা ক্যাটের বদলে নায়িকা কাজল চলে আসলো,

-আপনি এখানে কি করছেন?

-এইতো উড়তেছি।

-মানে?

-আপনি কে?

-আমি কাজল, আপনি তো কাকাতারুয়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, কিভাবে উড়ছেন?

-কিভাবে উড়তেছি তা জানতে হলে আপনাকে ক্যাট হতে হবে। তারপর আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

-আমি বিড়াল হবো মানে? কি বলছেন আবোলতাবোল?

মেয়েটা মনে হয় রেগে গেছে।

রেগে গেলে মেয়েদের সুন্দর লাগে, এই সৌন্দর্য দেখতে হলে মেয়েদের রাগ কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে দেখতে হবে। তার রাগ যেনো আপনার মনে কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে।

আমার সেই সৌন্দর্য দেখতে ইচ্ছে হলো কিন্তু চোখ খুলতে ইচ্ছে হলো না। অবশেষে আমার চোখ খোলার আগেই মেয়েটা চলে গেলো। এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে তাই আমিও লঞ্চের ভেতর চলে গেলাম।

মেয়েটাকে খুঁজতেছি,যদি পাই তাহলে আরেকটু রাগিয়ে দেবো। কিন্তু ভেতরে অনেক গুলোর মেয়ের মাঝে ক্যাট কে কিভাবে শনাক্ত করবো। এক টা কাজ করতে পারি, সব মেয়েদের কাছে গিয়ে নাম জিজ্ঞেস করবো। তাহলে ক্যাট কে পাওয়া যেতে পারে। তবে এটা খুবই বাজে কাজ হবে তাই আমি ছাদে চলে গেলাম একেবারে ৪ তলায়। ওখানে কেউ উঠে নাই, নামাজের জায়গা তাই জুতো খুলে উঠতে হলো। আমি হাত পা ছড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে আছি। আকাশটাকে মনে হচ্ছে বিশাল বড় একটা ছাদ, মাঝে মাঝে মেঘের টুকরো উড়ে যায় তখন মেঘের ছায়া পরে, মেঘ চলে গেলে আবার শেষ বিকালের রোদ গায়ে লাগে।

হঠাৎ হৈচৈ শুনে উঠে বসলাম। জেলেরা নৌকা থেকে আমাদের লঞ্চে ইট পাথর ছুড়তেছে। পরে জানতে পারলাম জেলেদের মাছ ধরা জালের উপর দিয়ে লঞ্চ চলে গেছে, জেলেদের মাছ ধরা জাল ছিড়ে যাওয়াতে তারা ক্ষেপে গিয়ে ইট পাথর ছুঁড়তেছে। সারেং কোন উপায় না দেখে লঞ্চের গতি বাড়িয়ে দিলো।

অনভিজ্ঞ সারেং এর কারণে আজ জেলেদের জাল ছিড়ে গেলো। আচ্ছা জেলেদের মাছ ধরা জাল কি সবসময়ই এমন কেটে যায়? যার প্রতিবাদ করতে জেলেরা তাদের সাথে ইট, পাথর জমা করে রাখে!হতেও পারে। অনভিজ্ঞ সারেং কে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

লঞ্চ নদীর বুক চিরে চলতেছে।
ঢেউ গুলো নদীর পাড়ে সজোরে আঘাত করতেছে। পাড় থেকে মাটির চাকা ওঠে নদীতে আছড়ে পরছে।
নদীর পাড় জুড়ে কাশফুলে সাদা হয়ে আছে। নতুন চরে ধান গাছের চারা চোখ ধাঁধানো সবুজের সমারোহ। লঞ্চের সাইরেনের শব্দে সেই সবুজের বুক থেকে উড়ে যায় সাদা ধবধবে বকের সারি। মাঝে মাঝে দেখা যায় নদীর পাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট ছোট্ট বাড়ি।

হঠাৎ আমি লক্ষ করলাম, একটা যাত্রীবাহি ট্রলার আমাদের লঞ্চের সামনে দিয়ে আড়াআড়ি ভাবে নদী পাড় হওয়া জন্য দ্রুত গতিতে চালাচ্ছে। আমি খুবই আতঙ্কিত হয়ে গেলাম, কারণ প্রথমত অনভিজ্ঞ সারেং, আর আমাদের লঞ্চ ট্রালারটির অনেক কাছে চলে এসেছে। লঞ্চটি ট্রলার এর উপর উঠিয়ে দিবে এমন অবস্থা। অবশেষে একটুর জন্য ট্রলারটি বেঁচে গিয়ে জয়ধ্বনি দিতে লাগলো।

৩য় তলার ছাদে ১০ বা ১২ বছরের একটা ছেলে বাদাম বিক্রি করতেছে। আমি ওকে ডাকালাম, বললাম আমাকে বাদাম দিয়ে যেতে। ও জুতা খুলে আমার কাছে ছাদে উঠে বসলো। ওর হাতে পলিথিনের প্যাকেট করা অনেক গুলো বাদামের প্যাকেট।

কিছু প্যাকেট বড় কিছু প্যাকেট ছোট। ও জিজ্ঞেস করলো, ছোট টা দেবো নাকি বড় টা দেবো?

-কোনটার কি দাম?

-ছোট টা ৫ টাকা, বড় টা ১০ টাকা।

-ও আচ্ছা।তুমি যে বাদাম বিক্রি করো, সবাই তোমার বাদাম খাইতেছে কিন্তু তুমি কি খেয়েছো?

-নাহ।

আমি ওকে ২০ টাকা দিয়ে বললাম ১০ টাকা দামের ২ টা প্যাকেট দাও। একটা আমি খাবো, আরেকটা তুমি খাবে। আমার তেমন বাদাম খাওয়ার অভ্যাস নেই তাই ঠিক মতো খোলস ভাঙ্গতে পারছি না। কিন্তু ছেলে বেশ চমৎকার করে খোলস থেকে বাদাম বের করে তারপর হাতের তালুতে ঘষা দিয়ে ফু দেয়, বাদামের কালো চামরা গুলো বাতাসে উড়ে যায়, তারপর মুখের ভেতর ছুড়ে মেরে কুট কুট করে খাচ্ছে। আমার কেনো জানি মনে হলো বাদাম খাওয়া একটা শিল্প। আর এই শিল্প, ছেলেটা সবচেয়ে ভালো পারে।আমি জিজ্ঞেস করলাম,

-তোমার নাম কি?

-ফুল মিয়া।

-তো ফুল মিয়া, তুমি আজ কতো টাকার বাদাম বিক্রি করেছো?

-বেশি না, ৫০০-৬০০ টাকা।

-এতে লাভ হবে কতো?

-অর্ধেক অর্ধেক।

-টাকা দিয়ে কি করবা?

-ঘরের বাজার লাগলে করি, না লাগলে জমাইয়া রাখি।

-তোমার বাবা কি করে?

-মাছ ধরে।

-তাহলে তুমি বাদাম বিক্রি করো কেনো?

-বাবা আমার পড়ালেখার খরচ দেয় না, বলে তার লগে মাছ ধরতে।

-তুমি কোন ক্লাসে পড়ো?

-এবার বৃত্তি পরীক্ষা দিমু।

-ও আচ্ছা, বড় হয়ে কি হতে চাও?

-অনেক বেশি পড়ালেখা করে বিরাট বড় অফিসার হতে চাই।

-খুব ভালো। মন দিয়ে পড়ালেখা করো, আমার বিশ্বাস তুমি তুমি কোনো বড় অফিসার হবে।

-দোয়া করিয়েন ভাই, আমি এবার যাই।

ফুল মিয়া নেমে চলে গেলো। আমি তাকিয়ে আছি সূর্যের দিকে। কুসুমের মত সূর্যটা দিগন্ত রেখায় ধীরে ধীরে নদীর ভেতর ডুবে যাচ্ছে, যেখানে আকাশ-নদী মিলিত হয়েছে। অর্ধেক সূর্য নদীর পানিতে তার প্রতিবিম্ব মিলে একটি সম্পুর্ণ সূর্য তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে অর্ধেক সূর্য আকাশে আর অর্ধেক সূর্য পানিতে। তবে পানির অর্ধেক টা ঢেউ এর সাথে তাল মিলিয়ে নৃত্য করতেছে। কিছুক্ষনের মধ্যেই সূর্যের অবশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেলো। আকাশ

রঙিন করে নামলো গোধূলি। তুলো তুলো মেঘ গুলো লাল, লালচে কালো, হলুদ, আসমানি আরো কত অদ্ভুত রঙে রঙিন হয়েছে এবং তার প্রতিবিম্ব নদীর পানি লালচে করে দিয়েছে। সব মিলিয়ে এক অপূর্ব দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। লঞ্চে না উঠলে এতো সুন্দর গোধুলি উপভোগ করা যেতো না। গোধুলি নিয়ে একটা কুসংস্কার আছে, তা হলো, হাসান-হোসাইনের রক্ত আকাশে এমন লালা বর্ণ ধারণ করে। এটা ভুল ধারণা। যদি হাসান-হোসাইন এর রক্ত হতো তাহলে কেন শুধু পশ্চিম দিকে লাল বর্ণ ধারণ করে, পূর্ব দিকে কেন নয়? রাতের আাকাশেই বা কেনো কোনো রঙ থাকে না। এটা প্রকৃত পক্ষে সূর্যের আলোর ৭ রঙের খেলা। আমরা যে নীল আকাশ দেখি ঐটা মূলত সূর্যের আলোর নীল রঙ ছড়িয়ে আছে, এছাড়া আর কিছুই নেই। আকাশে যে রংধনু দেখি তা সূর্যের আলোর সাত রঙের বিচ্ছুরনের ফল। আপনি চাইলে বাসায় বসেও রংধনু তৈরি করতে পারেন, এর জন্য বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই। একটা বাটিতে পানি ভর্তি করে তার মধ্যে এটা ছোট আয়না কাত করে ডুবিয়ে দিয়ে যেদিক থেকে সূর্যের আলো আসে সেইদিকে রাখতে হবে। এর পর সূর্যের আলো আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে যেখানে পরবে সেখানে সাদা একটি কাগজ ধরবেন তাহলেই রংধনু দেখতে পাবেন। রংধনু টা সোজা তৈরি হবে যদিও আকাশের রংধনু বাকা দেখা যায়। আসলে ঔটা বাকা নয়, ভূপৃষ্ঠ সমান্তরালে দূরের কোনো বড় জিনিস কে অর্ধগোলাকার দেখায়। কারন আমাদের পৃথিবীর

গোলাকার।

মাগরিবের আজান দিয়েছে। একদল মুসল্লী নামাজ পড়তে এসেছে,এরা মনে হয় তাবলীগ এর লোক। তাদের সাথে আমিও নমাজ পড়তে দাঁড়িয়েছি। সবাই পশ্চিম দিক করে নামাজে দাড়ালো। কিন্তু নামজের মধ্যেই লঞ্চ ঘুরে পূর্ব দিকে চলতে শুরু করলো। সবসময় নামাজ পড়ি পশ্চিম দিকে আর আজ পড়লাম পূর্ব দিকে। নামাজ শেষ করে তাবলীগের আমির কে জিজ্ঞেস করলাম, এইযে আমরা পূর্ব দিকে নামাজ পড়লাম, আমাদের কি নামাজ হয়েছে? আমির সাব আমাকে বুঝিয়ে বললেন যে নামাজের শুরুতে পশ্চিম দিক করে দাঁড়ালে হয়, তারপর যেদিকেই যাক সমস্যা নেই।

যাই হোক, আমার নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে গেলো। তবে অনেক মুসলিম আছে যারা শুধু পশ্চিম দিকে নায়, উত্তরদিকে, দক্ষিণ দিকে, পূর্বদিকে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে।
এতে বিস্মিত হওয়ার কারন নেই আমরা কাবাঘরের দিক দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ি। হাজি সাহেবরা কাবাঘর কে কেন্দ্র করে নামাজ পড়ে। আমাদের দেশ থেকে কাবাঘর পশ্চিমে তাই আমারা পশ্চিম দিক ফিরে নামাজ পড়ি। যাদের দেশ থেকে কাবাঘর পূর্ব দিকে নামাজ পড়বে এটাই স্বাভাবিক। তবে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে দাঁড়িয়ে আপনার যেদিক ইচ্ছে সেই দিক নামাজ পড়তে

পারবেন। ভেবে বের করুন, খুবই সোজা। আমির সাহেব কে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? আমি আমির সহেব কে জিজ্ঞেস করলাম, -হুজুর, একটা জায়গা আছে যেখানে নামাজ পড়ার জন্য কোন দিক নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই, যেদিক খুশি সেই দিকে নামাজ পড়তে পারবেন। সেই জায়গা টা কোথায়? আমির সাব আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন।

লঞ্চের আনাচে কানাচে সবখানে বাতি জ্বলছে। বাতির আলোতে লঞ্চের চারপাশের পানি দেখা যাচ্ছে। কিছু দূর পর পর বড় আকারের টিভি চলতেছে। সিঁড়ির নিচে তিনকোনা জায়গাটুকু তে দোকান দেয়া হয়েছে। চকলেট থেকে শুরু করে সব কিছুই পাওয়া যায় কিন্তু দাম দ্বিগুণ। আমি এক কাপ চা এবং এক প্যাকেট পটেটো কিনলাম। চা ১০ টাকা, পটেটো ২০ টাকা। চা আর পটেটো নিয়ে লঞ্চের এক কোনায় বসে টিভি দেখতেছি আর চা দিয়ে পটেটো খাচ্ছি, গরম ঝাল ঝাল মিষ্টি মিষ্টি অন্য রকম টেস্ট। টিভি তে কি যেনো একটা মুভি চলতেছে। নায়িকার বাবা নায়ক কে বলতেছে, বলো কত টাকা হলে তুমি আমার মেয়ের জীবন থেকে সরে যাবে? নায়ক নায়িকার বাবাকে বলতেছে, চৌধুরী সাহেব, আমি গরীব হতে পারি, কিন্তু আমার ভালোবাসা গরীব না। কিন্তু টিভির দিকে কারো মন নেই। যে যার যার মতো বসে আছে, শুয়ে আছে। সবাই মোবাইল নিয়ে ব্যাস্ত,কানে হেড ফোন দিয়ে গান শুনছে। সুন্দরী মেয়েদের দিকে

ছেলেরা তাকিয়ে আছে। একটা মেয়ে দেয়াল সাথে হেলান দিয়ে হাটু ভাজ করে বসে আছে। মেয়েটার দিকে তাকিয়ে আমি হতভম্ব হয়ে গেছি। মেয়েটার কি কোনো শরম লজ্জা কিছুই নেই? যতই খারাপ মেয়ে হোক, সবার মাঝে নেঙ্গটো হয়ে বসে থাকবে! পরে বুঝতে পারলাম মেয়েটা নেঙ্গটো নয়, স্কিন কালার টাইট পড়েছে। তাই মনে হচ্ছে কিছু পড়ে নেই। তবে যা পড়েছে ওটা পড়া আর না পড়া এক কথা।

লঞ্চের ভেতর যাত্রীরা তাদের সংসার ভালোই গুছিয়েছে। কাথা, বালিশ সব কিছুই আছে, সাথে করে রাতের খাবার রান্না করে নিয়ে এসেছে। খুঁটির সাথে দেশি মুরগী বাধা, গ্রাম থেকে টাটকা শাক সবজি, লাউ, কুমরা, নারিকেল আরো অনেক কিছু সাথে করে নিয়ে এসেছে। যদিও ঢাকা তে টাকা হলে সব ই পাওয়া যায়।

লঞ্চের ভেতর থাকলে মনে হয় লঞ্চ স্থির। কোন দিকে চলছে, লঞ্চ মাটিতে নাকি পানিতে তাও বুঝা যায় না। আমি চলে গেলাম ৩য় তলায়। প্রতিটা কেবিনের সামনে একটা টেবিল এবং ২ টা চেয়ার রয়েছে। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। পানির দিকে তাকিয়ে আছি। নদীর পানি লঞ্চের পাশ দিয়ে ছিটকিয়ে পড়ছে। হঠাৎ কেবিনের দরজা খুলে একটি মেয়ে বের হলো। মেয়েটি খুব সুন্দর, চিকন, মাথার চুল রং করা, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, জিনস

প্যান্ট আর নীল টপস পড়া। আমাকে দেখে বেশ অবাক হয়ে তাকিয়ে বললো, আপনি এখানে কি করছেন? কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারলাম এই মেয়েটাই ক্যাট। আমি বললাম

-আপনিই তো সেই ক্যাট, তাই না?

মেয়েটি রেগে গিয়ে বললো,

-আমি কাজল। আপনি বার বার আমাকে বিড়াল বলছেন কেনো?

-এমনেই মজা করে বললাম।

-এখানে একা একা বসে আছেন কেন?

-আমি একা তাই।

ক্যাট আমার সামনের টেবিলে বসলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো আপনার সাথে আর কেউ আসে নাই।

-নাহ, আমি একাই।

-ও আচ্ছা। আমরা ঢাকা থেকে ছোটো মামার বিয়েতে আসছিলাম। এখন ব্যাক করতেছি। আপনি যাচ্ছেন কোথায়?

-এটা ঠিক বলা যাচ্ছে না, লঞ্চের সারেং অনভিজ্ঞ। দেখা গেলো পথ ভুল করে বঙ্গোপসাগরে নিয়ে গেলো।

-ও মাই গড। তারপর কি হবে?

-তার পর বঙ্গোপসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের চলে যাবে,ওখানে বরফের পাহাড়ের সাথে লঞ্চ ধাক্কা লেগে ডুবে যাবে। তারপর আপনি আর আমি একটা ভেলা ধরে ভেসে থাকবো। আপনি থাকবেন ভেলার উপরে, আমি থাকবো পানিতে গলা পর্যন্ত ডুবে, আপনি আমার হাত ধরে রাখবেন। মেয়েটি অত্যন্ত

রেগে গিয়ে বললো,
-হোয়াট ননসেন্স! আপনার মাথায় প্রোবলেম আছে। ভালো এক জন সাইকোলজিস্ট দেখান।
মেয়েটি উঠে কেবিনে চলে গেলো।

ভাত খেতে হবে, রেস্টুরেন্টে গেলাম। রেস্টুরেন্টে ঢুকে মনে হচ্ছে না আমি কোনো লঞ্চে আছি। রেস্টুরেন্টে সব কিছুই পাওয়া যায়। আমি ভাত, ভাজি, আর তেলাপিয়া মাছ নিলাম। রান্না বেশ ভালো তাই তৃপ্তি করে খেলাম। আমার বিল হলো ৮০ টাকা। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হলাম।

পটেটো দিয়ে চা খাওয়া ঠিক হয় নাই। পেটের মধ্যে কেমন যেনো করতেছে। বাথরুমে যেতে হবে। কিন্তু বাথরুমের কাছে গিয়ে দেখি বিশাল বড় লাইন। কিছুক্ষন লাইনে দাঁড়িয়ে মনে হলো ১ ঘন্টার আগে কিছু হবে না। আমি লাইন ছেড়ে ৩য় তলায় কেবিনের জন্য যে বাথরুম আছে ওখানে ঢুকে গেলাম।

ডেকে কয়েক টা জায়গায় তাস খেলার আসর জমেছে। সেই তাস খেলা দেখার দর্শক ও কম নেই। আমিও দাড়িয়ে খেলা দেখতলাম।

রাত ১২ তার মতো। সবাই বাতি বন্ধ করে শুয়ে পরেছে। আমি

চলে গেলাম সেই অনভিজ্ঞ সারেং এর রুমে।

-স্যার ভেতরে আসবো?

-আসেন।

-আপনি সারারাত ধরে লঞ্চ চলান ঘুম আসে না?

-নাহ, এটাই তো আমার কাজ। তাছাড়া আমি দিনে ঘুমাই।

-ওহ, আচ্ছা যদি কখনো পথ ভুল করেন তাহলে কি হবে?

-পথ ভুল করবো কেনো? ১০ বছর ধরে লঞ্চ চালাই। পানি দেখে নদীর নাম বলে দিতে পারি।

আমি ছাদে চলে গেলাম। পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলোতে চারপাশ রোমাঞ্চকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমি চিত হয়ে শুয়ে চাঁদ দেখতেছি। চাঁদের আলো আমার শরীরে বৃষ্টির মত ঝরতেছে। এভাবে কখনো চাঁদ দেখা হয় নাই। চাঁদ টা আমার সাথে সাথে চলতেছে।

আমাদের লঞ্চকে পিছনে ফেলে আরো অনেক গুলো লঞ্চ চলে যাচ্ছে। লঞ্চ গুলো আমাদের লঞ্চের প্রায় দ্বিগুন। এগুল বরিশাল লঞ্চ ঘাট থেকে ছেড়ে এসেছে। নদীতে প্রচুর ঢেউ। আমাদের লঞ্চ নৌকার মতো দুলতেচে। এটা মনে হয় পদ্মা নদী। চাঁদপুরের কাছাকাছি চলে এসেছি। নদীর তীরে সারি সারি বাতি জ্বালছে। এগুলো প্রকৃতপক্ষে নদীর পাড়ে সারিবদ্ধ নয়, অনেক দুরে দুরে অবস্থিত।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম বুঝতে পারছি না। প্রায় সকাল হয়ে গেছে। সদরঘাট দেখা যাচ্ছে, ঘাটে সারিবদ্ধ হয়ে লঞ্চ গুলো দাড়িয়ে আছে। এরা অনেক আগেই চলে এসেছে। লঞ্চ ঘাট করবে, সবাই নামার জন্য প্রস্তুত। কার আগে কে নামবে এমন একটা প্রতিযোগিতার জন্য দাড়িয়ে আছে। লঞ্চ ঘাট করার সাথে সাথে সবাই স্রোতের মতো নেমে পড়বে। আমি ব্যাগ ২ টা নিলাম। টিকেট কাটা হয় নাই। টিকেট কাটতে গেলাম মতো এক লোক বললো তোমার টিকেট কাটা লাগবে না, আমার সাথে চল, আমি পার করে দেবো, আমাকে ১০০ টাকা দিলেই হবে। আমি ভাবলাম সে যদি ১০০ টাকায় পার করতে পারে তাহলে আমার তো কোনো সমস্যা নেই, আরো ১০০ টাকা বেচে যাবে। আমি বললাম, আচ্ছা ঠিক আছে। লোক টা আমাকে ৩য় তলায় ছাদের উপর নিয়ে গেলো। তারপর আমার ব্যাগ ২ টা নিয়ে পাশের একটা লঞ্চে লাফ দিলো। পাশের লঞ্চটা প্রায় ৫-৬ ফুট দুরত্বে। লোকটা আমাকে বলতেছে লাফ দিয়ে ঔ লঞ্চে যেতে। আমার বুক ধড়ফড় করা শুরু হয়ে গেলো। কারণ আমার জীবনে কখনো এমন লাফ দেয়ার অভিজ্ঞতা নেই। ঠিক মতো লাফ দিতে না পারলে বুড়িগঙ্গার পানি খেয়ে মরতে হবে। আমার পিছনে থেকে কে যেনো বলতেছে, ধর ধর, পালাচ্ছে। আমি কোনো কিছু না ভেবে এক লাফ দিলাম। লোকটি আমার হাত না ধরলে হয়তো

পানিতে পড়ে যেতাম।

আম তাকে ১০০ টাকার একটা নোট দিয়ে লঞ্চ থেকে নেমে লঞ্চের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমার শরীর শীতল হয়ে আসতেছে।

রাইহান
১ম বর্ষ,ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

চিত্রকর্ম

তানভীর আকরাম
মাস্টার্স, ভূতত্ত্ব ও খনিবিদ্যা বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

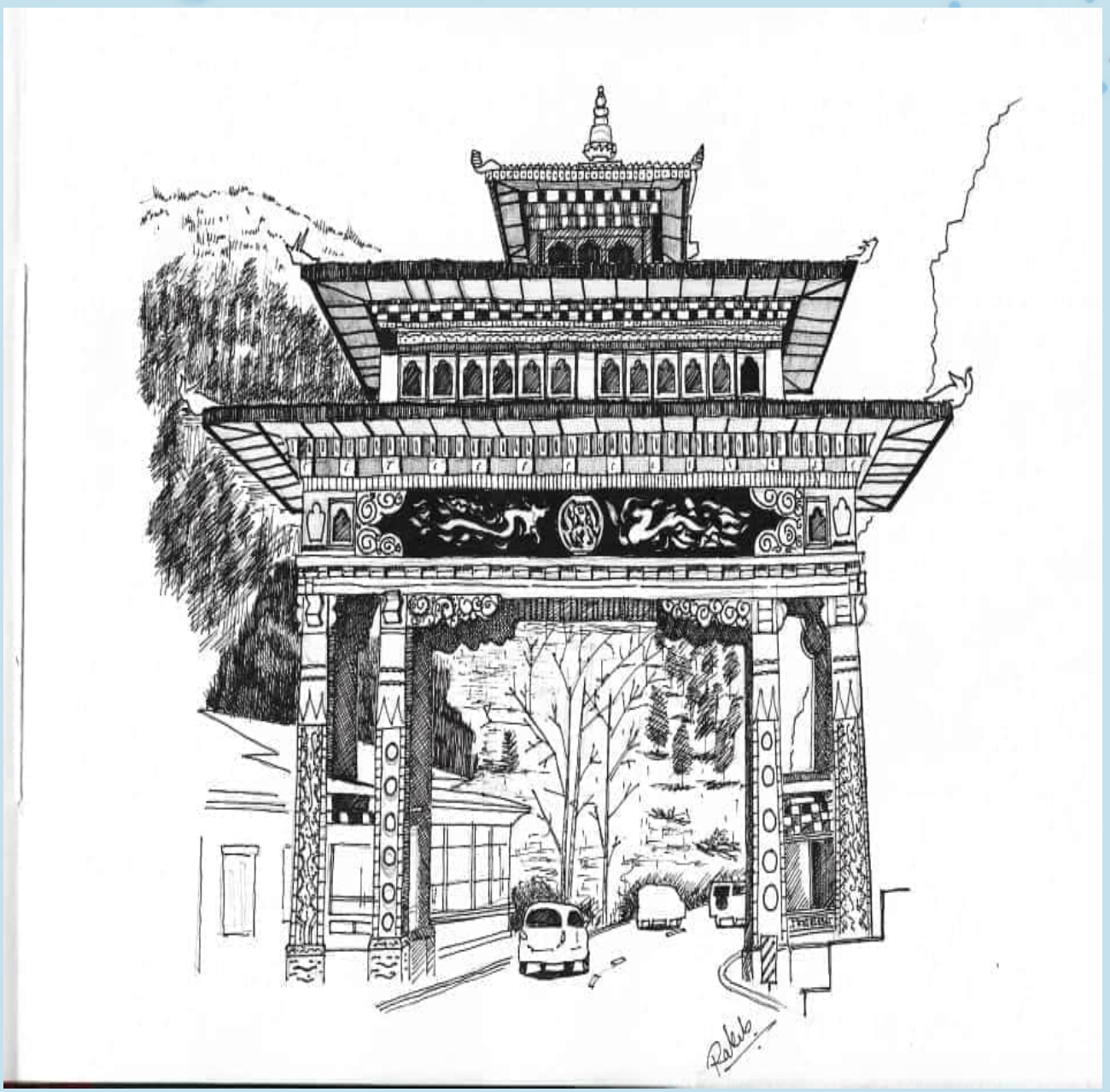

মোহাম্মদ রাকিব
২য় বর্ষ, স্থাপত্যবিদ্যা,
রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

চিত্রকর্মঃছায়ানীল

তাসনিয়া তাবাসসুম ময়ূরী
১ম বর্ষ, প্রাচ্যকলা ও ছাপচিত্র বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

মুমতা হেনা মীম
১ম বর্ষ, অর্থনীতি বিভাগ,
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাপ্ত

মাসিক
বর্ণালী
আগস্ট, 2020
অবসরে সাহিত্য চর্চা,
দূর হবে বিষন্নতা
প্রথম
সংখ্যা
সম্পাদনায়
মোঃ রফিকুজ্জামান রফিক